প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2009 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মন্তব্য প্রতিবেদন ■ মতিউর রহমান

'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগকে সামলান'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুধু ওই দিনের রক্তাক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ওই মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি, বরং ওই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে এ রকম আরও সন্ত্রাস আর বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। এ 'রক্তাক্ত যুদ্ধ' হয়েছিল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের মধ্যে। এবারও অধিকাংশ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দলাদলি থেকে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে মূলত পরিচালিত হতে শুরু করেছিল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী তৎপরতা, তাদের 'গডফাদার'দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে, তাদেরই নির্দেশে। এর সবই তখন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এ কে আজাদ চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীদের জ্ঞাতসারে। সে সময় আমরা মন্তব্য প্রতিবেদনে লিখেছিলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এই যে সিট দখল, হল দখল, পাল্টা দখল, বন্দুকযুদ্ধ চলেছে, তা বন্ধ করতে উপাচার্যই বা কী করতে পারেন। কারণ, দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা মন্ত্রীরা তো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। কিছু করেনও না। বরং তিনি যা বলেন, তাতে তারা সস্নেহে প্রশ্রয়ই পায়।'

১৯৯৯ সালের ২৫ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমরা তো শিক্ষাঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রাখিনি। কিন্তু অন্য দল যখন অস্ত্র নিয়ে আসে, সন্ত্রাস করে, তখন আমাদের ছেলেরাও উৎসাহী হয়, তারাও তো তরুণ।' তিনি এ কথা বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসীরাই অনেক সময় ছাত্রলীগে জোর করে যোগ দেয়। সেটা কী করা যাবে?' এ কথাগুলো বলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এক অর্থে প্রশ্রয়ই দিয়েছিলেন।

এবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু না বলে নির্বাচন-উত্তর সহিংসতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিএনপির অভ্যন্তরীন কোন্দলকে দায়ী করেছিলেন। এতে সব মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

সেদিন (৯ মে, ১৯৯৯ সাল) আমরা ওই মন্তব্য প্রতিবেদনে বলেছিলাম, 'দেশজুড়ে বর্তমানে সন্ত্রাস যে বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা প্রতিরোধে সরকারকে আশু দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগসহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাসীদের বাদ রেখে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব নয়। সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।' যা আজকের দিনে আরও বেশি করে প্রযোজ্য।

পরে আমরা দেখেছিলাম, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের বহু অঞ্চলে ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দোর্দণ্ড প্রতাপে বাধাহীনভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ, যুবলীগ বা আওয়ামী লীগকে সামাল দিতে পারেননি। আর, এই ব্যর্থতার ফল তাঁরা হাতেনাতে পেয়েছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরাট ব্যবধানে হেরেছিল। যদিও এর জন্য ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়াও সরকার ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, সাংসদ, হুইপ ও গডফাদার এবং নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ এবং বহুক্ষেত্রে ব্যর্থতাগুলো বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। আমাদের মনে আছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথমবারের মতো প্রথম হয়েছিল।

১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সাল, তেমন দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু তার পরও নতুন প্রধানমন্ত্রীকে আবারও সেসব কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। কারণ, গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৯ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অন্তত ১৫টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বেশির ভাগ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের সঙ্গেও সংঘর্ষ হয়েছে ছাত্রলীগের। খুলনা মেডিকেল কলেজসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে নির্বাচনের ফলাফল মহাজোটের দিকে যাওয়ার পরপর রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো জবরদখল করে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তারা কক্ষে কক্ষে তালা ঝুলিয়ে নিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পুরান ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়। তারা সাতটি কক্ষ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-তিন দিন ধরে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। যদিও এবারের সংঘর্ষ বা দখলের ঘটনা এখনো ১৯৯৯ সালের মতো ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। তবে সেসব লক্ষণ অনেকটাই স্পষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও তিনি প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আইন নিজের হাতে তুলে না নিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে কই। আসলে দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মুখের কথা বা লিখিত নির্দেশের তোয়াক্কা করছে না ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা।

নতুন সরকারে এসেই ডিজেল-কেরোসিন ও সারের দাম কমানোর মাধ্যমে এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে—তাদের নির্বাচনে প্রার্থী না করে এবং মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ চমক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তাদের সেই চমকে কালির আঁচড় পড়তে শুরু করেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক অস্থিরতায় সরকারের নিশ্চয়ই ভেতরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রচেষ্টা আছে। তবে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রকাশ্য কোনো উদ্যোগ বা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তৎপরতায় সরকারের কোনো কোনো মহলের সমর্থন আছে বলে মনে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

এবার আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের চেয়েও অনেক বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বড় রকমের আশাবাদ সৃষ্টি করেছে। নতুন সরকারে এসেই ডিজেল-কেরোসিন ও সারের দাম কমানোর মাধ্যমে এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে—তাদের নির্বাচনে প্রার্থী না করে এবং মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ চমক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তাদের সেই চমকে কালির আঁচড় পড়তে শুরু করেছে। সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের সদিচ্ছাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শুরুতেই যদি এমন হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ কী হবে—সেটা ভেবে মানুষের মধ্যে এখনই শঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে।

আমাদের মনে পড়ে, আমরা ছাত্রদল নিয়েও একই কথা বলেছিলাম। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের ৩৫ দিন পর ওই বছরের ১৫ নভেম্বর আমরা মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছিলাম, 'প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলকে সামলান!' মনে আছে, ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ ও জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের দখলমুক্ত করতে ছাত্রদলের ক্যাডাররা লাঠিসোটা দিয়ে ভাঙচুরের পাশাপাশি গোলাগুলি করেছিল। পিস্তল ও কাটা রাইফেল নিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডারদের হল দখলের বেশ কিছু ছবি সে সময় ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে ছাপাও হয়েছিল। জগন্নাথ হল দখল শেষে তৎকালীন ছাত্রদলের সভাপতি ও সাংসদ নাসির উদ্দীন আহম্মেদ পিন্টু সেখানে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছাত্রদলের ক্যাডারদের সাফল্যে তাদের ধন্যবাদ জানান, উৎসাহ জোগান। তারপর তাঁর ক্যাডার বাহিনী পিস্তল আর বন্দুক নিয়ে জহুরুল হক হলের দখল নেয়।

১৫ নভেম্বর *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই সন্ধ্যায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান পরপর আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, 'আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। দেখবেন ছাত্রদলকে নিয়ন্ত্রণ করব।' ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর ছাত্রদলের হল দখলের পরের দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির তৃতীয় বৈঠকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেকোনো ধরনের জবরদখলের জন্য দায়ী এবং অবৈধ অস্ত্রধারী যে-ই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর ১৭ নভেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। আর, নির্বাচনে বিজয়ের এক মাস ১০ দিন পর ছাত্রদলের সভাপতি এবং সাংসদ নাসির উদ্দীন পিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু নয় মাস পর ছাত্রদলকে আবার সক্রিয় করা হয়। এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসী, অছাত্র ও ঠিকাদারসহ ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও কখনো বন্ধ হয়নি। সে চেষ্টাও প্রধানমন্ত্রী করেননি।

ওই লেখার দুই বছর পর ২০০৩ সালের ৮ আগস্ট আমরা মন্তব্য প্রতিবেদন লিখে বলেছিলাম, 'প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলকে সামলাতে পারেননি।' বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পাঁচ বছর ধরেই তাদের অব্যাহত সন্ত্রাস, বন্দুকযুদ্ধ, অপহরণ, হত্যা, চাঁদাবাজি, জবরদখল চলে। এসব কিছুর পরিণতি কী হয়েছিল, তা আমরা জানি। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট মাত্র ৩১টি আসন পেয়ে বিরাটভাবে পরাজিত হয়েছে। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে সেদিন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেগম জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান এখন দেশছাড়া। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর নিজেই অস্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়েছেন। কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি প্রায় দেড় বছর জেলে ছিলেন। হারিছ চৌধুরী বহু বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে এখন বিদেশে আত্মগোপনে।

বিগত বছরগুলো এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কার্যক্রমের কথা স্মরণ করে আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার বলতে চাই, ছাত্রলীগকে সামলান। যেন এ বছরই কিংবা আগামী বছর আমাদের আবার বলতে না হয়, 'প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগকে সামলাতে পারেননি।'

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ একসময় আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছিল। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগকে সহযোগী সংগঠনের মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে জাতির গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং শান্তির সংগ্রামে বীর সেনানী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার সাংগঠনিক নেতৃত্ব আমাদের পথচলার কঠিন সংগ্রামে যেন স্নেহের শীতল বারি।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শাসনামলের শুরুতেই যদি ছাত্রলীগ নানা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে থাকে, তবে সন্ত্রাস, দখল ও চাঁদাবাজমুক্ত শান্তিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে স্বপ্ন দেশবাসী দেখতে শুরু করেছে, তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

● মতিউর রহমান : সম্পাদক, *প্রথম আলো*।